বাস্তুহারা

অবিনাশ ভৌমিক

অবিনাশবাবু বাস থেকে নেমে সেলিমপুর রোড ধরে হাঁটতে লাগলেন। তিরিশ বছর পর আজ মল্লিকার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তিরিশ বছর বড় কম সময় নয়। সব কিছুই আমূল বদলে গিয়েছে এই তিরিশ বছরে। মানুষও তো বদলে গিয়েছে। সে তো বিলাসপুর থেকে কখনো-কখনো কলকাতায় এলেই টের পান অবিনাশবাবু। মাঝে-মাঝে এ-ও ভাবেন যে রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করে বিলাসপুর শহরের উপকণ্ঠে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনে যে ওখানেই থিতু হয়েছেন, সে বরং ভালোই। ওখানকার বাঙালীরা এখনো একটু আগের মতোই আছে। হয়তো প্রবাসী বলেই। অবিনাশবাবু একটু শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, মল্লিকাও কি বদলে গিয়েছে? আগে কয়েকবার কয়েকদিনের জন্য কলকাতা এলেও মল্লিকার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারেননি অবিনাশবাবু। তিরিশ বছর আগে একবার এসেছিলেন। বাঁশদ্রোণীতে মল্লিকার বাপের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন ওর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা। তখন ছিলো বাপুজিনগরে ওদের টালির ঘর জবরদখল কলোনীতে। গিয়েছিলেন সকালের দিকে, ছুটির দিন। শাশুড়ি, স্বামী আর একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে ছিলো মল্লিকার সংসার। ওর শাশুড়ি আর স্বামীর আন্তরিক অনুরোধে সেদিন খেয়ে বিকেলে ভাইপোর বাড়ীতে ফিরতে হয়েছিলো অবিনাশবাবুর।

মল্লিকার স্বামী অতুলবাবুই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মল্লিকা তো আপনাদের রাজশাহীর লোক পেলে আমাদের কথা ভুলেই যায়। আপনাকে যদি শুধু চা, জলখাবার খাইয়ে ছেড়ে দিই, তাহলে আমার ঘাড়ে আর মুন্ডু থাকবে না। তার ওপর আপনি আবার ওর বাল্যবন্ধু। মল্লিকার শাশুড়িও সস্নেহে বলেছিলেন, কথাডা ঠিকই বাবা। দ্যাশের মানুষ পাইলে হগ্গলডিরই মনে আনন্দ হয়। দুফুরে খাওয়া- দাওয়া কইররা বিকালে যাইও।

এরপর চোখের ইংগিতে মল্লিকার শাশুড়ি অতুলকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর অবিনাশবাবু দেখেছিলেন অতুল লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবী চাপিয়ে বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে গেলো। বুঝেছিলেন , বাড়ীর কর্ত্রী মল্লিকার শাশুড়িই। এসব ভাবতে ভাবতে অবিনাশ একসময় রেল লাইন পার হলেন। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন একটা অচেনা জায়গায় এসে পড়েছেন। কাঁচা বাড়ি প্রায় চোখেই পড়ল না। দোতলা, তিনতলা, পাকা বাড়ির সমারোহ চারদিকে। সময়টা ছিল বিকেল। অনেক ব্যালকনিতেই লক্ষ্য করলেন ম্যাক্সি পরে মেয়ে- বৌরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে ট্রানজিস্টার বা টিভি থেকেহিন্দী গানের চটুল সুর।

অবিনাশ ভাবলেন মল্লিকার বাড়িটি কি খুঁজে পাবেন? এটুকু মনে ছিলো যে একটা ছোট্ট কবরখানা ছাড়িয়ে অল্প দূরেই ছিলো ওদের বাড়ি। একসময় কবরখানাটি চোখে পড়ল ওঁর। আরেকটু এগিয়ে একটা মিষ্টির দোকান দেখতে পেলেন। সেখানেই জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, অতুল ভৌমিকের বাড়িটা কোন দিকে? দোকানী অবিনাশবাবুকে একটু খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললো, অতুলবাবু তো নেই, বছর দুয়েক আগে গত হয়েছেন। আপনি কি ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন ? বিমূঢ় অবিনাশ উত্তর দিলেন, না, না, ওঁর স্ত্রীও আমার পরিচিত। দোকানী তখন আঙুল দিয়ে একটা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল ওই তো , ওই বাড়িটা। বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালেন অবিনাশ । বেশ আধুনিক ডিজাইনের দোতলা বাড়ি। নীচতলার সামনের দিকে কয়েকটা দোকান আর একটা শূন্য গ্যারেজ । দোকানের পাশেই একটা ছোট্ট গলি। গলিতে ঢুকে বাঁ দিকের একটা দরজার কলিং বেল টিপলেন অবিনাশ।

কিছুক্ষণ পর একটা ভারী পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে দরজার ওপাশে থামলো। দরজাটা খুলে গেলো । অবিনাশ দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ভারিক্কি চেহারার, রঙ ময়লা এক দীর্ঘদেহী যুবক। একটু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কাকে চাই? অবিনাশ বললেন, আমার নাম অবিনাশ চৌধুরী, বিলাসপুরে থাকি। আমি মল্লিকার পরিচিত। ছেলেটির মুখটা এবার একটু নরম হল, ও হ্যাঁ, মার কাছে আপনার কথা শুনেছি, ওপরে আসুন। অবিনাশ ছেলেটির পেছন- পেছন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বুঝলেন নীচতলাটা ভাড়া দেওয়া আছে।

ছেলেটি অবিনাশকে দোতলার বেশ প্রশস্ত ড্রয়িং কাম ডাইনিং মে এনে বসালো একটা সোফায়। আরেকটি সোফায় একটা বাচচা মেয়েকে নিয়ে বসে টি .ভি. দেখছিলো সুবেশা একটি সুন্দরী যুবতী। একটু অবাক হয়ে চোখে প্রশ্ন নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকালো মেয়েটি। ছেলেটি পরিচয় করিয়ে দিল - ডলি, ইনি মা'র রাজশাহীর বাল্যবন্ধু , বিলাসপুরে থাকেন, এঁর কথা শুনে থাকবে। তারপর অবিনাশের দিকে ফিরে বলল - ডলি আমার স্ত্রী। ডলি সোফায় বসেই একটু হাসার চেষ্টা করে হাত জোড় করলো নমস্কারের ভঙ্গিতে। তারপর টি.ভি .-র দিকে চোখ ফেরালো । ছেলেটি বলল, আমি মা'কে খবর দিই। বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

অবিনাশ বাচচা মেয়েটিকে একবার হেসে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। মেয়েটি ওঁর দিকে দু'পা এগিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মা'র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, মা, আমি ঐ দাদুটার কাছে যাব? ডলি টিভি থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললো, যাও। মেয়েটি ছুটে এসে বসে পড়লো অবিনাশের পাশে।

অবিনাশ মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী দিদিভাই? ও হেসে বলল, ডাক নাম চুমকি, ভালো নাম শ্রেয়া । আমার বাবার নাম দীপ্তিময়, মার নাম ডলি, আর ঠাম্মার নাম মল্লিকা। তারপর হঠাৎ সোফার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে অবিনাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার মা না, বাবাকে দীপু বলে ডাকে। বরের নাম নেওয়া দোষের, তাই না? ঠাম্মা একবার বলে মার কাছে খুব গালাগাল খেয়ে আর কিছু বলে না। ডলি টিভি তে এত নিবিষ্ট ছিল যে মেয়ের দিকে কোন নজর ছিল না।

এমন সময় মল্লিকাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল দীপু। মল্লিকার পরনে একটা শাদা খোলের নীল পাড়ের শাড়ি। কানে কানচাপা দুল, গলায় স হার, দুহাতে একগাছা করে চুড়ি । মুখে উদ্ভাসিত হাসি নিয়ে মল্লিকা এগিয়ে আসছিল অবিনাশের দিকে। অবিনাশ মল্লিকার সিঁথির দিকে তাকাতে সাহস করলেন না। চোখে চোখ রেখে হেসে বললেন, 'মল্লি , ভালো আছিস? মল্লিকা অবিনাশের সামনে এসে দাঁড়ালো , হ্যাঁ, ভালো। তোরা সব ভালো তো, অবি? বলেই চুমকির পাশে বসে পড়ল মল্লিকা।

এমন সময় দীপু বলে উঠলো, কি খাবেন মামাবাবু ? প্রেসার, সুগার, পেট সব ঠিক আছে তো? অবিনাশ বললেন, হ্যাঁ বাবা, এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। বাড়িতে যা আছে -টাছে তা-ই দিয়ে কিছু করে দিক না বৌমা। অবিনাশবাবু লক্ষ্য করলেন দীপু আর ডলির মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। দীপু একটু শুকনো হেসে বললো, ডলি বাড়িতে খুব ভালো খাবার তৈরী করতে পারে মামাবাবু। তবে আজ কিছুক্ষণ পরেই টিভি -তে ,একটা সুপারহিট হিন্দী ছবি দেখাবে। নাম শুনে থাকতে পারেন - 'মহববত কী খিলাড়ি'। আমি বরঞ্চ দোকান থেকে কিছু এনে দিই। অবিনাশ লক্ষ্য করলেন মল্লিকা কী একটা বলে উঠতে গিয়েও চুপ করেগেলো । বেরিয়ে গেল দীপু।

কিছুক্ষণ পরেই খাবার নিয়ে ফিরলো ও। ভেতরে চলে গেলো। মল্লিকাও ভেতরে চলে গেলো । একটু পরেই দীপু ঘরে ঢুকে ডলির সামনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় যেন কী বললো। ডলি একটু ভ্রূ কুঁচকে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেল। দীপু এসে বসলো অবিনাশের পাশে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করো বাবা? দীপু বেশ আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো,

একটা নামী প্রাইভেট ফার্মের সেলস এক্সিকিউটিভ। শিগ্গীরই একটা গাড়ি কিনব ভাবছি। নীচে ফাঁকা গ্যারেজটা লক্ষ্য করে থাকবেন। এখন মোটর বাইকেই চালিয়ে দিচ্ছি। অবিনাশ একটু আঁৎকে উঠলেন, মোটর বাইক নিয়ে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করো না কি? দীপু একটু হেসে বললো, কেন করবো না, ডলি আর চুমকিকে নিয়েও তো বেরোই অনেক সময়। একটু ডেয়ারিং না হলে কি এই হাই কম্পিটিশনের যুগে বাঁচা যায়? অবিনাশ বললেন, না,না, দীপু , গাড়িটা বরং তাড়াতাড়ি কিনে ফেলো । রোজগার তো ভালই কর। দীপু একটু অমায়িক হেসে মুখটা অবিনাশের মুখের একটু কাছে এনে চাপা গলায় বলল, মাইনে, অ্যালাউয়েন্স ইত্যাদি নিয়ে তো ভালই পাই। তাছাড়া সেলসে আছি , একটু হয়- টয় আর কি , বোঝেনই তো। অবিনাশের মনে হল দীপু জানাতে চাইছে যে মল্লিকা ওর বাবার আমলে যা-ই থাকুক, এখন ওর আমলে আর কোন কষ্ট নেই, বেশ সুখেই আছে।

এমন সময় দরজার দিকে নজর পড়ল অবিনাশের। ট্রেতে চা, জলখাবার নিয়ে এগিয়ে আসছে ডলি। পেছনে নতমুখী মল্লিকা। দীপু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছোট টেবিলটা এনে রাখলো সোফার সামনে। ডলি চা, জলখাবার টেবিলের ওপর রেখে ট্রে নিয়ে ফিরে চলে গেলো। কিছুক্ষন পরে আবার এসে বসলো টি.ভি. দেখতে।

খাওয়া হয়ে গেলে দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মামাবাবু, আমি যে একটু বেরোবো, জরুরি কাজ। আপনি আর মা বরঞ্চ ছাদে গিয়ে গল্প-টল্প কন। অনেকদিন পর দেখা। দীপু চলে গেল নিজের ঘরে পোশাক পাল্টাতে।

মল্লিকা কাপ-প্লেটগুলি নিয়ে চলে গেলো। ফিরে এসে টেবিলটা যথাস্থানে রেখে অবিনাশবাবুকে বললো, চল্ অবি, ছাদে যাই। দু'জনে ছাদে এসে বসলো। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকাশে তৃতীয়ার একফালি ছাদ। হাল্কা মেঘ ভেসে যাচ্ছে চাঁদকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে। কংক্রিযের বাড়ীগুলিকে ম্রিয়মান জোৎস্নায় যেন একটু নরম-নরম মনে হচ্ছে। কয়েকটি পাখি ভিড় ছেড়ে নীড়ের দিকে চলে গেলো। হঠাৎ হাওয়ায় কেঁপে উঠে গাছের ডালপালা, পাতাগুলি যেন কিছু বলে উঠছে। নীরবতা ভেঙ্গে প্রথম কথা বললো মল্লিকা।
— বৌ, ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?
— ভালোই। বছর পাঁচেক আগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। দিল্লীতে থাকে বরের কাছে।ছেলে তো মেয়ের চেয়ে ছোট, একটা চাকরি করছে রেলে।
— এরপর ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আন।
— হ্যাঁ, ওর বিয়ের কথা ভাবছি।
মল্লিকা এবার কথা ঘোরালো। যেন বাল্য আর কৈশোরের অবিকে নিয়ে ভিড় ছেড়ে নীড়ে ফিরে যেতে চাইছে।
— রাজশাহীর দিনগুলি বেশ ছিলো, তাই না?
— তা ছিল, মল্লি।
— তুই তখন খুব মারকুটে ছিলি। এখনো আছিস নাকি? বৌকে মারিসটারিস?
— নাঃ মল্লি, এখন আর কাউকে মারি না। মারার লোক কোথায় পাই।
— ক'দিন বাদেই তো বিলাসপুর ফিরে যাবি। ধারে-কাছে কেউ নেই, শেষ মারটা মার না।
— সেদিনের সেই মারের দাগগুলি মন থেকে বুঝি এখনো মুছে ফেলতে পারিস নি, মল্লি?
— মুছে ফেলতে চাইনি।
এতদিন পর এসব কথা বড় বিমনা করে মানুষকে। চুপ করে গেলেন অবিনাশ। মল্লিকাও চুপ। দু'জনেই কি মারা আর মার খাওয়ার সুখ থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকায় একটা চাপা দুঃখের মধ্যে ঢুকে গেলেন? না কি এই দুঃখ থেকেই এক ধরনের আনন্দ পেতে লাগলেন? নীরবতা ভাঙ্গলেন প্রথম অবিনাশই।

— মনে আছে মল্লি, তোর মার তহবিল তছপ করে রামুর দোকান থেকে চপ এনে তোদেরই বাড়ির কোন নিরালা জ

ায়গায় আমাকে খাওয়াতি? নিজে তো পাপ করেইছিস, আমাকেও পাপের ভাগী করেছিস মল্লি।
— এখন তো নিজের পয়সায়ও মনের মতো করে কাউকে কিছু খাওয়াতে পারি না, অবি। সেতো আরও বড় পাপ।
অবিনাশবাবু বুঝলেন মল্লিকার কোন্ সংগোপন দুঃখের জায়গায় অসতর্কভাবে হাত দিয়ে ফেলেছেন তিনি। কথা ঘোর াবার জন্য বললেন, তুই তো স্কুলে টিচারি করতি। রিটায়ার করেছিস বোধহয়।
— হ্যাঁ, দু'বছর আগেই।
— সময় কি করে কাটে?
— কেন, বাড়ীর কাজ করে!
— আর?
— বই পড়ে বা টি.ভি.-তে কোনো ভালো প্রোগ্রাম থাকলে, তাই দেখে। চুমকিকেও তো পড়াই।
— ও কোন ক্লাসে পড়ে?
— একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ওয়ানে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি।
এমন সময় সিঁড়ির গোড়া থেকে কর্কশ নারীকণ্ঠ বলে উঠলো, চুমকিকে পড়াবার সময় কিন্তু অনেকক্ষণ পার হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অবিনাশবাবু চমকে মল্লিকার দিকে তাকালেন। দেখলেন, মল্লিকা মাথা নীচু করে বসে আছে। দেখে মায়া হলো অবিনাশের। বললেন — আমি এখন উঠি মল্লি। মাথা নীচু করেই মল্লিকা বললো, হ্যাঁ, ওঠ্। আর কোনদিন আ সিস না এ বাড়ি, বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো মল্লিকা । রেলিং-এ ভর দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগলো একটি বিধবস্ত, পরাজিত মানুষ। কয়েক ধাপ পেছনে নামতে লাগলেন অবিনাশবাবু।

অবিনাশবাবুর হঠাৎ মনে হলো, দ্বিতীয়বার বাস্তুচ্যুত হয়েছে মল্লিকা, যা প্রথমবারের চেয়েও আরো অনেক বেশি মম র্ান্তিক।